"গীতারত্ন" শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ প্রবর্তিত ধর্ম ও জাতীয়তাবাদী বাংলা মাসিক পত্রিকা (৬৫ তম বর্ষ)

পার্থসারথি

(মুদ্রণ : জুন, ১৯৬০ থেকে মার্চ, ২০২০ / অন্তর্জালে প্রকাশ : এপ্রিল, ২০২০ থেকে)

Website: https://www.parthasarathipatrika.com

৫৩তম অন্তর্জাল সংখ্যা

৭ই ভাদ্র, ১৪৩১ / 24.08.2024

—: সম্পাদক :—

সুনন্দন ঘোষ

DO NOT COPY

-: সূচীপত্র :-

প্রীতি-কণা	শ্রী প্রীতিকুমার ঘোষ
স্মৃতিচারণ	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
কবিরঞ্জন সাধক রামপ্রসাদ	শ্রীসুধীরকুমার মিত্র
বুমলা চিনতে চীন সীমান্তে	শ্রী অরূপ কুমার ভট্টাচার্য্য
ঘুমোও মেয়ে	শ্রী সুবীর ঘটক
বিচার	শ্রী সুনন্দন ঘোষ

Founded by Sri Priti Kumar Ghosh in June, 1960, PARTHASARATHI Bengali Monthly Magazine, RNI 5158 / 60, published in print format for sixty years, then converted to e-magazine by Sri Sunandan Ghosh, Editor & Publisher in April, 2020 during prolonged Nationwide Lockdown and now being published through the Website: https://www.parthasarathipatrika.com

Contact: 182 Jessore Road, Flat- D/1, Kolkata- 700074. WhatsApp: 9433284720.

DO NOT COPY

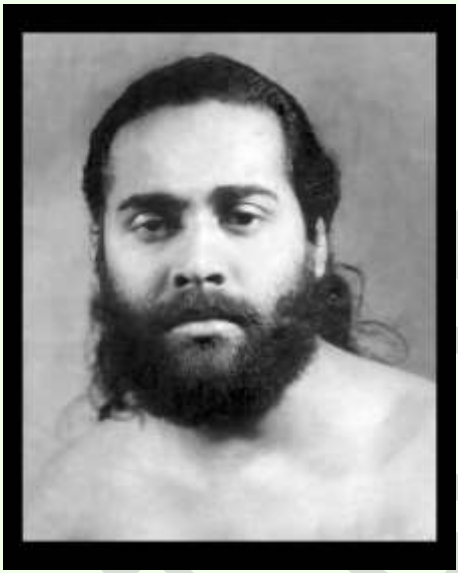

(১০ই মার্চ, ১৯২৬ – ২৪শে নভেম্বর, ১৯৮৬)

প্রীতি-কণা

"শ্রীকৃষ্ণ একটি আদর্শ চরিত্র। শ্রীকৃষ্ণে আছে প্রেমভক্তি, জ্ঞান ও কর্ম। এই তিনের সমন্বয় সাধন করলে সহজেই কৃষ্ণে যুক্ত হওয়া যায়। শুধু শক্তি অর্জন করলেই হবে না। সংসারে থেকে সমতা ও সমন্বয় যোগ করতে হলেই চাই জ্ঞান কর্ম ও ভক্তি - এই ত্রিমার্গের যোগ। কৃষ্ণে আছে চতুরতা কৌশল। সে যোগ-কৌশল আয়ত্ব হলে সংসারে থেকেই যোগে পূর্ণতা আনা সম্ভব।"

DO NOT COPY

স্মৃতিচারণ **শুক্লা ঘোষ**

দেখতে দেখতে শ্রীপ্রীতিকুমার প্রয়াত হবার পর পাঁচটা বছর পূর্ণ হয়ে গেল। কি সাঙ্ঘাতিক ভাবে আমরা দিন কাটিয়েছি তা' পরিচিতজন মাত্রই জানেন। বিপদের সময় যাঁরা সহায়তা করেছেন, তাঁদের সন্তুষ্ট করতে ব্যতিব্যস্ত হয়েছি। আসলে মানুষের সংগ্রাম শেষ নিঃশ্বাস ফেলা পর্যন্ত। শ্রীপ্রীতিকুমার বেঁচে গেছেন। তাঁকে অনেক মর্মান্তিক ঘটনা দেখতে হয়নি। তাঁকে কোন আইন-আদালত পর্যন্ত যেতে হয়নি। নিজের সন্তানের গতিবিধির উপর তাঁকে নজর দিতে হয় না। বাড়ীতে একা থাকবার নিঃসঙ্গতা তাঁকে পীড়িত করে না। বোধহয় আমার উপস্থিতির জন্য অনেক ভালবাসার পাত্রপাত্রীরা দূরে সরে গেলেন। কারণ ঐ গলা গলা, ধন্য হয়ে যাওয়া ভাবটা আমার চরিত্রের মধ্যে ছোটবেলা থেকেই নেই। সেইজন্য শ্রীপ্রীতিকুমার বেশ রসিয়ে রসিয়ে গল্প করতেন, "তোমার বৌদি আজ একে এমনভাবে বলেছে, তোমার বৌদি আজ এই কথা বলেছে, ঐ কাজ করেছে, ইত্যাদি।" অনেকে আমাকে পছন্দ করেন না, কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে, যে ব্যক্তি এরকম অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, তিনি কি ইচ্ছে করলে নিজের স্ত্রীকে একটু শান্ত, আত্মস্থ করে রাখতে পারতেন না? আমার এভাবে বিচরণ করাতো তাঁরই ইচ্ছেতে। তাই আজ আর চিন্তা করিনা।

এবার পুজোয় বেনারসে তিনদিন রইলাম। মনে আছে প্রথম যখন বেনারসে যাই শ্রীপ্রীতিকুমার বাড়িতে ছিলেন। আমি বসাকবাবু, তপতী আর তার মায়ের সঙ্গে গেছিলাম। শ্রীপ্রীতিকুমার তখন কোথাও গেলে আমাকে ষ্টেশনে see off করতে যেতেন। ট্রেন ছাড়া পর্যন্ত নানা বিষয়ে সতর্ক করে দিতেন। বিশেষ করে বাপী সঙ্গে গেলে তিনি কিছুতেই আমার উপর ভরসা করতে পারতেন না। আমি চোখ কান বন্ধ করে অপেক্ষা করতাম কখন ট্রেনটা ছাড়ে। যতদূর দেখা যায় হাত নাড়তেন। মুখটা খুব ম্লান লাগতো। কিন্তু এসব দুর্বলতা দেখাতে তিনি একেবারেই রাজী ছিলেন না। বেনারস যাবার সময় বলেছিলেন, কোনও মাটির জিনিস কিনবে না, কোনও অস্ত্র কিনবে না। কেন বলেছিলেন জানিনা। কিন্তু আমি বরাবরই দেখছি মাটির ঘটে

করেই ঁশ্রীবিশ্বনাথের মাথায় জল ঢালা নিয়ম। এবার আমি আমার ঘট কিনলাম। বসাকবাবুদের সঙ্গে যেবার গেছিলাম সেবার তো শিবের মাথায় জল ঢালাই হয় নি। ওসব বিশ্বাস তখন আমার ছিল না। আমি ছিলাম মনে প্রাণে কম্যুনিস্ট। পূজার্চনাতে আমার একেবারেই উৎসাহ ছিল না। যাইহোক এই কাশীতে শ্রীপ্রীতিকুমার রাধেশ্যামের খোঁজ পেয়েছিলেন। কি খুশীই হয়েছিলেন! সেই রাধেশ্যাম এখন আমার তীর্থ দর্শনের প্রধান সহায়। তিনি এখন রীতিমত স্বামীজী। পূর্বাশ্রম সম্বন্ধে এঁরা কোনও কথা উচ্চারণ করেন না। তাই অনেকেই অনেক কথা জানতে পারেন না। এটা ঠিক এই স্বামীজী যদি কৃপা না করতেন আমার এতো মানসিক শান্তি বজায় থাকতো না, তীর্থদর্শন করবার এতো সুযোগ পেতাম না। পুণ্য সঞ্চয় যদি নাই হয় তাহলে এতো হাজার হাজার লোক সমবেত হন কেন? নিশ্চয়ই কিছু প্রাপ্তি ঘটে। কার কি হয় জানি না, আমি অন্তত জগন্নাথদেবের রথের রশিতে হাত দিয়ে নিজেকে ধন্য মনে করি, কুম্ভস্নানে নিজেকে পুণ্য করি। গত পাঁচ বছরে কত মন্দির যে দর্শন করলাম, কত তীর্থ যে ঘুরলাম! শান্তি পেয়েছি সেকথা অনস্বীকার্য! কিন্তু যেই বাড়ির দরজায় পা দিই সব কেমন মলিন হয়ে যায়। সেই তিনটে বাস বদলে কলেজ যাওয়া, সেই কোর্টের খোঁজ খবর, সেই আবার রান্না-বাজার-দুধের হিসেব, etc. etc. শ্রীপ্রীতিকুমার থাকতেই বলতাম, "আমার আর জন্ম হবে না, আমার ব্রহ্মলাভ হয়ে গেছে। যে যে জায়গাগুলি ঘুরে এসেছি তাতে আমারও বিশ্বাস আমি আর জন্মাব না।"

যাক! এবার আমার বারাণসী দর্শনের বিবরণ দিই। স্বামী বিবিদিষানন্দজীর অনুমতি না নিয়ে যেতে ভরসা পাই নি। তাই টিকিটটা লক্ষ্ণৌ পর্যন্তই কাটা ছিল। মহারাজ অল্প সময়ের জন্য কলকাতা এসেছিলেন। তিনি জানালেন ঐ এক টিকিটে আমি দুদিন বেনারসে থাকতে পারি।

ট্রেনে আজকাল আমার খুব শরীর খারাপ হয়। বিশেষ করে যদি কলে জল না থাকে, কিম্বা বাথরুমের জলে বাইরেটা থই থই করে, বাথরুম নোংরা থাকে, অথবা কোনও মহিলা তিন চারটি বাচ্চা নিয়ে চলাফেরা করেন, হঠাৎ হঠাৎ বাদাম

খেয়ে শাড়ির ভিতরে ফেলেন, নিজের জায়গা থাকা সত্ত্বেও অন্যের ঘাড়ে হাত পা ছড়িয়ে বসেন। মুখে কিছু বলা যায় না, কিন্তু ভিতরে কেমন একটা বিরক্তি হতে থাকে। তারপরই মাথা ধরে। জানলার ধারে সীট পেলে কিছুটা সুরাহা হয়। একটা বই নিয়ে বা বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকি। এবার হিমগিরিতে আমার বার্থ নং ছিল পাঁচ। সোমা টিকিট কাটলে মোটামুটি এক নম্বর বার্থটিই পাই। আজকাল সারাবছরই আমার ব্যাগে একটি টিকিট থাকে। সময় পেলেই আমি কোথাও পুজো দিতে চলে যাই। নিদেন পক্ষে পুরী। একা যাই শুনে অনেকে অবাক হয়ে যান। তারা বোধহয় আমার বয়সটা হিসেব করেন না। এ' বয়সে আর হারাবার ভয় থাকে না। শ্রীপ্রীতিকুমারের স্ত্রী হিসাবে বিপদের ভয়টাও কম করি।

যাইহোক দু' ঘন্টা late-এ হিমগিরি বারাণসীতে পৌঁছল। Smartly নিজের জিনিসপত্র নিয়ে নেমে পড়লাম। রিক্সাওয়ালা এলো। "মাইজী, কাঁহা যাইয়েগা?" জবাব, "ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ।" তাকিয়ে দেখি রিক্সাওয়ালা হাওয়া। ২য় বার আরেকজনের একই প্রশ্ন। সেও উধাও হবার আগে বলে গেল, "খালি নহী হ্যায়।" তৃতীয়জন এলো। বললো, "বহুত আদমী বারান্দামে বৈঠা হ্যায়। স্বামীজী লোক সবকো চন্দ্রা হোটেল পর ভেজ রহে হ্যায়।" ভাবলাম দৌড়ে গিয়ে হিমগিরিতে উঠে পড়ি। ভিতর থেকে কে যেন বলে উঠলো, "এতো চিন্তা কেন? মহারাজ ব্যবস্থা করেই রাখবে। একটু বিশ্বাস রাখতে পার না?" লজ্জা পেলাম। রিক্সায় উঠলাম। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে পৌঁছে শুনলাম বিবিদিষানন্দজী সামনেই আছেন। রিক্সাওয়ালা মাল নামাতে না নামাতেই একজন বৃদ্ধ স্বামীজী চীৎকার করে উঠলেন, "দেখছো না আমাদের জিনিসপত্র ঢাঁই করে রাখা আছে? এর মধ্যে মাল রাখবে কোথায়?" প্রকৃতপক্ষে সেদিন অনেক স্বামীজী আশ্রম ছেড়ে বিভিন্ন স্থানে যাত্রা করছিলেন। আমি তখন এত ক্লান্ত বিবিদিষানন্দজীকে আর পৃথক করে দেখতে পাচ্ছিলাম না। সকলেই গেরুয়াধারী। বেশীরভাগ মুণ্ডিত মস্তক। অগত্যা ..... বিবিদিষানন্দজী এগিয়ে এলেন। বল্লেন, "বাষট্টি নম্বর ঘরে চলে যান।" চাবী চাইতে বললেন, ঘর খোলা আছে। সেই ঘরে জিনিস নিয়ে ঢুকে আমার অবস্থা কাহিল। ডাঃ কুণ্ডুর মতো

এক ভদ্রলোক লুঙ্গি পরে বেরোচ্ছেন। আমার মাপের এক ভদ্রমহিলা সালোয়ার কামিজ পরে বসে আছেন। বাপীর সাইজের ও কৌশিকের সাইজের দুটি ছেলে হাফপ্যান্ট ও স্যান্ডো গেঞ্জী পরে দাঁড়িয়ে। বুঝলাম এরা বাংলার বাঘের দল। বাইরে এসে যারা শের বনে যান। আশ্রমের কর্মচারী নিরঞ্জন আমার চেনা। সে তড়পে উঠলো, "আপনারা এই ঘরে কেন? এই ঘর তো বুক করা!" ছেলে দুটি বলে উঠলো, "বাবা হোটেল দেখতে গেছেন।" আমার ঐ ঘরে থাকতে খারাপ লাগছিল। নিরঞ্জন সুবিধা করে দিলো। বলল, ৬৩ নং খালি আছে। চলে আসুন। "স্বামীজীকে বলে দিয়ো" বলে ঐ যে পড়লাম আর চলবার ক্ষমতা ছিল না। কিছুক্ষণ পর স্বামীজী এসে খবরাখবর নিলেন। রাত্রে খাবার ব্যবস্থা করলেন। আমি সেই যে শুয়েছি --- কোথায় মশারী আর কোথায় চোরের ভয়? এক্কেবারে সকাল! সকালে দরজা ধাক্কাধাক্কি। শ্রীমান চন্দন কুমার আমাকে পূজা দিতে নিয়ে যাবেন। স্বামীজীর সময় নেই। প্রেসিডেন্ট মহারাজ উপস্থিত আশ্রমে। তাঁর শরীর খুব খারাপ। অগত্যা চন্দন ভরসা! চন্দন এমন ভাব দেখালো যে শুধু আমার জন্যই সেদিন busy. আমাকে প্রথমে দশাশ্বমেধ ঘাটে নিয়ে গেল। মাটির ঘট আমি কিনলাম না। অগত্যা পিতলের ছোট্ট ঘট। গঙ্গায় স্নান করে জামাকাপড় অত লোকের মধ্যে বদলাতে পারলাম না। তাই প্রায় ভিজে জামা গায়ে দিয়ে নৌকা করে সিন্ধিয়া ঘাট। সেখান থেকে সিঁড়ি ভেঙ্গে সঙ্কটা দেবীর মন্দির। তারপর মণিকর্ণিকা হয়ে বিশ্বনাথের মন্দির। পূজা খুব ভালো করে দেওয়া হল। সেখান থেকে রিক্সায় কালভৈরব দর্শন। আমার বেনারস যাত্রা শেষ। আশ্রমে যখন ফিরে এলাম তখন জ্বর এসে গেছে। বিকালে প্রেসিডেন্ট মহারাজ কলকাতা যাত্রা করলেন। বিবিদিষানন্দজী স্টেশন থেকে কোনও গ্রামে গেলেন দলবল নিয়ে। বারান্দায় বসে বসে আমার সময় কেটে গেল। আপন মনে বসে বসে গান গাইলাম। আমি নিজেও কেমন অবাক হয়ে গেলাম অত ভাল করে আমি কি করে গান গাইলাম! পরের দিন ৬১ নং ঘরের অধ্যাপিকা সবিতা রাউথ জিজ্ঞেস করলেন, "কাল রাত্রে আপনার মেয়ে গান গাইছিলো?" আমি জবাব দিলাম, "আমার কোনও মেয়ে নেই!" যাইহোক, মঙ্গলবার সকালে কোনও কাজ ছিল না।

দেখা হল স্বামী সুন্দরানন্দজীর সঙ্গে। সুন্দর করে যে পুরাণ ইত্যাদির কাহিনী বলেন, শুনলে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। একমনে শুনতে ইচ্ছে করে। রাধেশ্যাম মহারাজ তো ফাঁকি দিলেন। দুপুর পর্যন্ত তাঁর দর্শন পাওয়া যায়নি। পরে শুনেছিলাম কোথায় স্টেডিয়ামের কুস্তি লড়াই দেখছিলেন ঘরে বসে। তিনি দুপুরে বেরিয়ে যাবার আগে খবরাখবর নিয়ে গেলেন। জিজ্ঞেস করলাম, "মন্দিরে আরতি দেখতে যাবো?" অনেক রাত হয়ে যাবে বলে নিষেধ করলেন। তাই আর যাওয়া হয়নি। সেদিন ছিল কোজাগরী লক্ষ্মী পূর্ণিমা। সারাটা সন্ধ্যা স্বামী সুন্দরানন্দজীর মুখ থেকে পুরাণের কাহিনী শুনলাম। কি ভালো লেগেছিলো বলবার নয়। কোথা দিয়ে সময় কেটে গেল বুঝতে পারিনি।

রাত্রে প্রসাদ খেয়ে শুয়ে পড়েছিলাম। রাধেশ্যাম মহারাজ ফেরবার পর আর দেখা হয় নি।

সন্ধ্যাতেই ৬১ নং ৬২ নং ঘর খালি হয়ে গেল। তখনও যাত্রী আসছে। আমি সদাশিবানন্দজীকে জিজ্ঞেস করলাম, "নীচের ঐ ঘরগুলি যে খালি হয়ে গেল আর কাউকে দেবেন না?" তিনি বললেন, "ঐ ঘরগুলি আমরা সবাইকে দিই না। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে দেওয়া হয়।" আমি তো তাঁকে বলতে পারছিলাম না একতলায় আর কেউ নেই। আমি একা। মনে মনে ঠিক করে নিলাম আজ রাত্রে Ativan ২টি খেয়ে নেবো। রাতে আর ঘুম ভাঙবে না। তাই হল। একদম রাত থাকতে ঘুম ভেঙ্গে গেল। মাঝে আর উঠিনি। মহারাজ যখন ডাকতে এলেন চারটার সময় তখন আমার স্নান পূজা শেষ।

এবার মনোবাসনা পূর্ণ হয়েছে। প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানে ত্রিরাত্রি বাস করে গেলাম। মনে কোনও ক্ষোভ নেই। জানি বিশ্বনাথ কৃপা করলে আমি আবার আসব। ট্রেন ছাড়বার সময় সকাল পাঁচটা পনেরো। মহারাজ আমাকে তুলে দিতে এলেন। নির্দেশ দিলেন বাপীর প্রতি সদয় হতে। মানসিক শান্তিটা বজায় রাখতে। বললেন, "একটি সন্তান দূরে থাকবে কেন? কাছে রাখাই তো দরকার।" ওকে আমি চিরদিন বয়ঃকনিষ্ঠের মতো দেখে এসেছি। আজ স্বামীজী হয়ে গেছেন, কিন্তু আমি তো সেই

আমিই আছি। তবু হাতজোড় করে প্রার্থনা করলাম যেন আমার মানসিক শান্তি বজায় থাকে। সন্তানের কাছ থেকে যেন আঘাত না পাই। আমি জানি ইশ্বর আমার সে প্রার্থনা যথাস্থানে পৌঁছে দিয়েছেন। তাই এখন মোটামুটি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান চলছে। জানি না আবার কি ঘটনা ঘটে ..... । গোরক্ষপুর ও লক্ষ্ণৌর কথা পরে লিখব।

এবার পার্থসারথির প্রসঙ্গে আসি। বইটা আরও একবছর চালাতে পারলাম। শ্রীপ্রীতিকুমারের আমলে যা ব্যয় ছিল এখন প্রায় তার দ্বিগুণ খরচ বেড়ে গেছে। তবু আমাদের জিদ পত্রিকাটা বন্ধ হতে দেওয়া যায় না। আমরাই গ্রাহক সংখ্যা কমাতে বাধ্য হয়েছি। মনে হয় আগামী বছরে পত্রিকাটির আরেকটু মূল্যবৃদ্ধি দরকার। এখন মাঝেমধ্যে শ্রীসুখদাচরণ মজুমদার, নীরেনদা পত্রিকাটি চালাবার উৎসাহ দেন। এই উৎসাহের মাত্রা আরেকটু বেশী হলে আমার খুব উপকার হয়। মানুষের জীবনীশক্তি ক্রমশই তো কমে আসে। তাই ভয় পাই যদি শেষ পর্যন্ত না পারি।

- - - - - - - - -

(** রচনাকাল - নভেম্বর, ১৯৯১)

"যাহা সত্য বলিয়া জানিব, তাঁহার জন্য জীবনপণ করিব। আর যাহা মিথ্যা বলিয়া বুঝিব, তাহা তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিব – এইরূপ দৃঢ় মনোবল প্রয়োজন। তাহা হইলে প্রকৃত মানুষ হওয়া যায়।"

--- স্বামী প্রণবানন্দ

DO NOT COPY

-এক-

বন্দে শ্রীগুরুদেব দেবকী চরণম্
অন্ধপুট খেলে ধন্ধ সব হরণম্।
জ্ঞানাঞ্জন দেহি অন্ধ কি নয়নম্
বল্লভ নাম শুনায়ত কারণম্।
সুচারু চরণদ্বয় হৃদে করি ধারণম্
প্রসাদ কহিছে হয় মরণের মরণম্। –রামপ্রসাদ

এই যে শ্যামলচঞ্চলা বনরাজিবিভূষিতা সরিৎবিপুলা উচ্ছ্বাসময়ী পতিতোদ্ধারিনী গঙ্গার দুই কূল - একে বলা হয় 'বারাণসী সমতুল', কারণ এর একটা চিরন্তন আদর্শ আছে; নীল আকাশ আর পতিতপাবনী কুলকুলনাদিনী গঙ্গার পূত পবিত্র বারি, তাই যুগ যুগান্ত ধরে আমাদের পাপরাশি বিধৌত করে নবজন্ম দিয়ে আমাদের নবজীবন দান করেছে বলে এই দু-কুলে জীবন্মুক্ত মহাপুরুষদের আবির্ভাবে আমরা ধন্য হয়েছি কৃতার্থ হয়েছি। এই মাটি অনন্তরসঘন মূর্তিরূপে আমাদের হৃদয়ের অন্তস্থলে যে আলো জ্বালিয়ে দেয়, তাতে আমাদের মনের অবসাদের অন্ধকার মুছে যায়। যে দীপালোক একদিন মহাপ্রভুর বুকে জ্বলেছিল, সেই দীপের আলো জ্বলেছিল রামপ্রসাদের প্রাণের ভিতর, আর জ্বলেছিল পঞ্চবটীতলে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের মনের মধ্যে। বাংলার স্বধর্ম পরায়ণ অবতার ভগবান শ্রীচৈতন্য, কবিরঞ্জন সাধক রামপ্রসাদ ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মধুর রসানুভূতিতে যে মহাকাব্যের সৃষ্টি হয়েছে সেই সাধনার ধারাতেই বাংলার নিজস্ব গানের সৃষ্টি, যতদিন বাঙ্গালীজাতি বেঁচে থাকবে, ততদিন বাঙালীর নিভৃত চিত্ততলের করুণ পর্দায় এই সব সঙ্গীতের মুর্চ্ছনা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হবে।

বাংলার জীবনের ধারায় যে সাধনার গান সমস্ত দেশকে ও দেশের লোকের প্রাণকে সজাগ করে রেখেছে - এই যে প্রাণের সঙ্গে প্রাণারামের সাক্ষাৎকার রামপ্রসাদের জীবনে তা সম্ভব হয়েছিল। মাটির রসের সঙ্গে সে দেশের মানুষের

DO NOT COPY

দেহের ও মনের একটা মিল আছে। সেই রসের আবেশে যে মূর্তি সৃষ্টি হয়, সেটাই হয় দেশের নিখুঁত ছবি। রামপ্রসাদের গানে বাঙালীর সেই নিখুঁত ছবি দেখা যায় বলে আজও বাংলার আকাশে বাতাসে সেই গানের লহরী খেলে বেড়াচ্ছে, আর তাই রামপ্রসাদের গানকে বলা হয় বঙ্গসাহিত্যের পদ্মরাগমণি।

তাঁর গানের ভাষা সহজ সরল, কিন্তু ভাবের গভীরতা ও গাম্ভীর্য এত বেশী যে, এর অর্থ সাধারণ মানুষ সহজে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। দার্শনিক তত্ত্বের জটিল সমস্যাগুলো তিনি সাধারণ গানের ভিতর দিয়ে যে ভাবে প্রকাশ করেছেন তা সত্যই অদ্ভুত বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।

হালিশহর কুমারহট্ট গ্রামে প্রায় আড়াইশো বছর আগে রামপ্রসাদের আবির্ভাব হয়েছিল। তখন বাংলাদেশ নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর শাসনাধীন; ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমলের ওয়ারেন হেষ্টিংসের শাসনকাল পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে বাংলাদেশে আট দশ বার শাসক পরিবর্তন, যুদ্ধবিগ্রহ, অরাজকতা, বর্গীর হাঙ্গামা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, প্রভৃতির অন্ত ছিল না। একটা মানুষের জীবনে এতো প্রকার রাষ্ট্রবিপ্লব ও দৈব দুর্বিপাক খুবই বিস্ময়কর ঘটনা। এই সবের মধ্যেও যে রামপ্রসাদ তাঁর নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখে নিজের দুরূহ সাধনায় সিদ্ধিলাভের সঙ্গে সঙ্গে দেশকে ধর্ম-সাহিত্য-সঙ্গীত-সংস্কৃতির স্থায়ী সৃষ্টিধারা দান করে গেছেন, এটাকে আজ বাংলাদেশ পাকিস্থানে হিন্দুদের অসহায় অবস্থা দেখে অসাধারণ দৈব প্রতিভার জ্বলন্ত নিদর্শন বলা যায়।

ইতিহাস রচনা করা আমাদের অভ্যাস নয়, তাই মনস্বী বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, "সাহেবেরা যদি পাখী মারিতে যান, তাহারও ইতিহাস লিখিত হয়, কিন্তু বাংলার ইতিহাস নাই। বাংলার ইতিহাস চাই - নহিলে বাঙ্গালী কখনও মানুষ হইবে না।" তাই রামপ্রসাদের সঠিক জন্ম ও মৃত্যু কাল নির্ণয় করা এখনও সম্ভব হয় নি। তবে রামপ্রসাদের সঙ্গীত সংগ্রহকার কৈলাস চন্দ্র সিংহ ও তাঁর বংশাবলী সংগ্রহকার দয়ালচন্দ্র ঘোষ বলেছেন যে, ১৬৪২ শকে (অর্থাৎ ১১২৭ বঙ্গাব্দ বা ১৭২১ খ্রীষ্টাব্দ) আশ্বিন মাসে তাঁর জন্ম হয়। কোন কোন গ্রন্থে তাঁর জন্ম ১১২৯ সালে হয়েছিল বলে

DO NOT COPY

লেখা আছে।

রামপ্রসাদ সেনভূমের প্রসিদ্ধ ধলহন্তীয় শ্রীহর্ষসেনের বৈদ্য বংশ সম্ভূত ছিলেন। তাঁর বংশের আদিপুরুষ কীর্তিবাস সেন। দয়াদাক্ষিণ্যে, সরল স্বভাবে ও কোমল ব্যবহারে সেকালে তিনি খুব প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এই সেনেরা বংশ পরম্পরায় তান্ত্রিক কুলাচারী ছিলেন। তাঁর পুত্র রামেশ্বর সেন বাবার মতই দানধ্যান করে অকালে মারা যান বলে আর্থিক উন্নতি বিশেষ কিছু করে যেতে পারেন নি। তাঁর পুত্র রামরাম আমাদের সাধক রামপ্রসাদের বাবা। যেমন কানু ছাড়া গীত হয় না, তেমনি 'রাম' ছাড়া এঁদের বংশের কখনও নামকরণ হতো না। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বংশেও এইরকম নামের সঙ্গে 'রাম' সংযুক্ত আছে দেখা যায়।

বিগত একশো বছরের মধ্যে সাধক রামপ্রসাদের জীবনী সম্বন্ধে নূতন কোন বিশেষ তথ্য আজও সংগৃহীত হয় নি। তিনি এক লক্ষ গান রচনা করেছিলেন, কিন্তু কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, কৈলাসচন্দ্র সিংহ, দয়ালচন্দ্র ঘোষ ও কালীপ্রসন্ন শর্ম্মা কাব্যবিশারদ অনেক কষ্ট করে মাত্র আড়াইশো তিনশোর মত গান সংগ্রহ করেন। এ ছাড়া অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত রামপ্রসাদের তথ্যমূলক জীবনী নিয়ে কিছু কিছু লিখেছেন। কিন্তু তাঁর গান সংগ্রহ যত হবে আমাদের বাংলাসাহিত্য তত পরিপুষ্টি লাভ করবে ও ঋদ্ধিমতী হবে।

গ্রামের কুমারহট্ট নামকরণ সম্বন্ধে মনে হয় যে এক সময় কুমোরদের বাস ও হাড়ি কলসীর হাট হতো তাই কুমোর হাট পরবর্তীকালে কুমারহাটে পরিণত হয়। আর একটি কিংবদন্তী হচ্ছে মহারাজা প্রতাপাদিত্যের পুত্র কুমার উদয়াদিত্য বহু লোকজন নিয়ে এখানে প্রায়ই গঙ্গাস্নান করতে আসতেন। কুমারের আগমন উপলক্ষে এখানে খুব বড় হাট বসতো। ধীরে ধীরে সেই হাট স্থায়ী হয় এবং তদনুসারে এই স্থান কুমারহট্ট বলে খ্যাতি লাভ করে। মহাপ্রভু একবার তাঁর গুরু শ্রীঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান দর্শন করবার জন্য কুমারহট্টে এসেছিলেন, এ সম্বন্ধে শ্রীবৃন্দাবন দাস লিখেছেন-

প্রভু বোলে কুমারহট্টেরে নমস্কার।

শ্রীঈশ্বরপুরীর যে গ্রামে অবতার।।
কান্দিলেন বিস্তর চৈতন্য সেই স্থানে।
আর শব্দ কিছু নাই 'ঈশ্বরপুরী' বিনে।।
সে স্থানের মৃত্তিকা আপনে প্রভু তুলি।
লইলেন বহির্ব্বাসে বান্ধি এক ঝুলি।।
প্রভু বোলে ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান।
এ মৃত্তিকা মোহর জীবন ধন প্রাণ।।

মহাপ্রভুর দেখাদেখি তাঁর শিষ্যেরাও সকলে মাটি উঠাতে লাগলেন এবং শেষে মাটি উঠাতে উঠাতে স্থানটি একটি খাদে পরিণত হয়ে গেল - সেই খাদটির নাম হচ্ছে 'চৈতন্যডোবা' এবং সেটি আজও এখানে বিদ্যমান আছে। এই রকম নালন্দার কাছে পাওয়াপুরীতে জৈনদের শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামী দেহরক্ষা করলে, তাঁর দেহ যেখানে ভস্মীভূত করা হয়েছিল, সেই স্থান থেকে তাঁর শিষ্যগণ চিতাভস্ম তুলতে তুলতে সেখানে এত লোক ছিল যে, সেটা একটা জলাশয়ে পরিণত হল। সেই জলাশয়ের মাঝখানে মহাবীরের যে স্মৃতি মন্দির আছে, তার নাম হচ্ছে 'জল মন্দির'। এই মন্দির দেখতে অতি চমৎকার। কুমুদকহ্লার সুশোভিত দীর্ঘিকার মাঝখানে স্বর্ণমণ্ডিত চূড়া ও শ্বেতশুভ্র মার্বেল পাথর মণ্ডিত মন্দির প্রাতে সূর্যকিরণে উদ্ভাসিত হয়ে এক অপূর্ব নয়নাভিরাম দৃশ্যের সৃষ্টি করে। এই 'চৈতন্যডোবা' মহাপ্রভুর স্মৃতিবিজড়িত পবিত্র পুণ্যস্থান।

কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, এক কালে এই স্থান খুব সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও জনকোলাহলে পূর্ণ থাকতো। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বায়ুসেবনালয় ও ধর্মাধিকরণ এখানে ছিল। মুকুন্দরাম লিখেছেন-

বামদিকে হালিশহর দক্ষিণে ত্রিবেণী।
দু-কূলের যাত্রীর রবে কিছুই না শুনি।।
লক্ষ লক্ষ লোক এক ঘাটে করে স্নান।
বাস হেম তৈল ধেনু কেহ করে দান।।

DO NOT COPY

এই বর্ণনা থেকেই বোঝা যায় যে, হালিশহর কুমারহট্ট, এক কালে খুব সমৃদ্ধিসম্পন্ন স্থান ছিল। রামপ্রসাদও তাঁর জন্মভূমি ও সিদ্ধপীঠ সম্বন্ধে বিদ্যাসুন্দরে বলেছেন-

ধরাতলে ধন্য সেই কুমারহট্ট গ্রাম।
তার মধ্যে সিদ্ধ পীঠ রামকৃষ্ণ ধাম।।
শ্রীমন্ডপে জাগ্রত শৈলেশপুত্রী যথা।
নিশাকালে চরিতার্থ শ্রীরঞ্জন তথা।।

সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে এই অঞ্চল সরকার সাতগাঁয়ের অন্তর্ভূক্ত ছিল। তখন এর নাম চিল 'হাবেলীশহর'। হাবেলী কথার অর্থ অট্টালিকা। অট্টালিকা বহুল স্থান ছিল বলে হাবেলীশহরের অপভ্রংশ হয় হালিশহর এবং এর একটি অঞ্চলের নাম হচ্ছে কুমারহট্ট। হালিশহর সম্বন্ধে চব্বিশ পরগণা ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে আছে- It was formerly called Kumarhata, and is a noted home of PANDITS; among other devotees of Gauranga, Ramprosad Sen lived here. কালক্রমে হালিশহর জঙ্গলাকীর্ণ নগণ্য গ্রামে পরিণত হয়। কিন্তু স্বাধীনতার পর এখন হালিশহরের রূপ অনেক পরিবর্তন হয়েছে। অনেক কালের অনেক পোড়োবাড়ীর রূপান্তর ঘটেছে পাকাবাড়িতে। এমন কি সাধক রামপ্রসাদের ঐতিহাসিক কালী মন্দিরের সামনে এই যে অনুপম নাটমন্দিরে আমরা সমবেত হই, এও তৈরী হয়েছে হালিশহরের 'রামপ্রসাদ স্মৃতি মন্দিরে'র অক্লান্ত চেষ্টায়। আর মন্দিরের মধ্যে মাতৃমূর্তি শ্রীসুধাংশুকুমার চন্দ রায়ের অর্থানুকূল্যে ২৯শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৪ সালে হয়েছে। আগে হালি শহরের নিসর্গ-বিস্তার ছিল অনেকটা এলোমেলো। কিন্তু এখন বেশ সুবিন্যস্ত। অনেকে বলেন যে, হালিশহরের আগের রূপটাই ছিল অকৃত্রিম। সেকালের জঙ্গলাবৃত পথ ঘাট, জরাজীর্ণ প্রাচীন গৃহ এবং ভগ্ন দেবদেউল নাকি বিপুল বিশাল অতীতেরই জাগ্রত প্রতীক হয়ে জেগে ছিল, তাই অনুভূতিশীল মনকে সহজেই তা নাড়া দিত এবং মনের মধ্যে রোমাঞ্চকর এক ধর্ম ভাবের উদ্রেক

DO NOT COPY

হতো। আমি কিন্তু অতীতের স্মৃতিতে নূতনের আবির্ভাবে এই পুণ্যপবিত্র স্থান আরও উজ্জ্বলতর হয়েছে দেখছি।

পঞ্চাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি গাঙ্গুলী বংশীয় সাবর্ণ চৌধুরীদের আদিপুরুষ পাঁচুশক্তি খাঁ (পাঠান আমলের রাজপুরুষ বলে খাঁ উপাধি ছিল) হাবেলীশহর পরগনার কর্তৃত্ব লাভ করে হালিশহর সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। কুমারহট্টের পণ্ডিত সমাজ একসময় শিক্ষায় দীক্ষায় পশ্চিমবঙ্গে নবদ্বীপের সমতুল্য প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন।

রামপ্রসাদ তাঁর জীবনী বা তাঁদের বংশ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু লিখে যাননি। শুধু তাঁর 'কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর' গ্রন্থে তিনি যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন, তার কয়েক লাইন এখানে উদ্ধার করছি -

ধনহেতু মহাকুল, পূর্বাপর শুদ্ধমূল, কীর্তিবাস তুল্য কীর্তি কই।
দানশীল দয়াবন্ত, শিষ্টশান্ত গুণান্বিত প্রসন্না কালিকা কৃপাময়।।
সেই বংশে সমুদ্ভূত, বীর সর্বগুণ যুত, ছিলা কত শত মহাশয়।
অনাচার দিনান্তর, জন্মিলেন রামেশ্বর, দেবীপুত্র সরল হৃদয়।।
আত্মজ রামরাম, মহাকবি গুণধাম, সদা যারে সদয়া অভয়া।
প্রসাদ তনয় তার, কহে পদে কালিকার, কৃপাময়ী ময়ি কুরু দয়া।।

এই বিবরণ থেকে পরিচয় পাওয়া যায় যে, কীর্তিবাস ছিলেন তাঁর বংশের আদিপুরুষ আর 'ধনহেতু মহাকুল' ও 'দানশীল দয়াবন্ত' এই কথাগুলি থেকেও জানা যায় যে, এই বংশ খুব দানশীল ও ঐশ্বর্যশালী ছিল। কিন্তু রামপ্রসাদের পিতা রামরাম যে কোন কারণেই হোক খুব নিঃস্ব হয়ে পড়েন, তাই রামপ্রসাদকে অল্পবয়সে লেখাপড়া ছেড়ে উদরান্নের জন্য কলকাতায় গিয়ে চাকরী করতে হয়েছিল।

রামপ্রসাদের পিতার দুই বিবাহ; প্রথমার গর্ভে একটি পুত্র হয়-তাঁর নাম নিধিরাম, রামপ্রসাদের বৈমাত্রেয় ভাই, আর দ্বিতীয়ার গর্ভে দুটি কন্যা ও দুটি পুত্র হয়। কন্যাদের নাম অম্বিকা ও ভবানী আর পুত্রদের নাম রামপ্রসাদ ও বিশ্বনাথ। রামপ্রসাদের ভজনঘাট নিবাসী লোকনাথ দাশগুপ্তের কন্যা যশোদা দেবীর (মতান্তরে সর্বাণী দেবী) সঙ্গে খুব অল্প বয়সেই বিবাহ হয়। রামপ্রসাদ বাল্যকালে বাংলা, হিন্দী,

সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন এবং চাকরী করতে কলকাতায় গিয়ে পারস্য ভাষা খুব ভাল করে শিক্ষা করেন।

রামপ্রসাদের ১৭ বছর বয়সে পিতার মৃত্যুর পর সংসারের সমস্ত ভার তাঁর উপর গিয়ে পড়ে, তাই তিনি কলকাতায় গিয়ে প্রথমে কোম্পানীর অধীনে তারপর গরাণহাটার প্রসিদ্ধ জমিদার দুর্গাচরণ মিত্রের বাড়িতে মুহুরীগিরির চাকরী করেন। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে চাকরী করার সংবাদের বিষয় ডঃ কালীকিঙ্কর দত্ত তার Alivardi and His Times নামক গ্রন্থে যা লিখেছেন তা এখানে উদ্ধারযোগ্য-

Thus the poet Ramprosad Sen, formerly a clerk under the Company, mastered Persian within a short time through the help of a Maulavi. The chapter on MADHAVA BHAT'S JOURNEY TO KANCHIPURA, in his 'Vidyasundara' gives us some idea of his proficiency in Persian and Urdu such was the case with Bharat Chandra. (Pp; 239-240)

রামপ্রসাদ ছিলেন শক্তিমন্ত্রের উপাসক - শাক্ত, তাই ছেলেবেলা থেকেই তিনি কালীমাতার বিশেষ ভক্ত ছিলেন। কোম্পানীর চাকরীর পর মিত্র মহাশয়ের জমিদারী সেরেস্তায় চাকরী স্বীকার করলেও, ঈশ্বরীয়ভাবে তাঁর মন সব সময়ে পূর্ণ থাকত। গানের মাধ্যমে তিনি তাঁর ইষ্ট দেবতার সঙ্গে কথাবার্তা পর্যন্ত বলতেন। সুমধুর স্বরে যখন রামপ্রসাদ গান করতেন, তখন তাঁর বাহ্যজ্ঞান পর্যন্ত লুপ্ত হতো। মিত্র মহাশয় রামপ্রসাদের কবিত্ব, ধর্মানুরাগ, সত্যপ্রিয়তা এবং জগন্মাতার প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি প্রভৃতি বিবিধ সদ্‌গুণের জন্য তাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন ও ভালবাসতেন।

চাকরী পেয়ে রামপ্রসাদ মায়ের নামে মেতে উঠলেন। প্রাণ চায় খালি মায়ের নামে বিভোর হয়ে থাকতে। অন্তরের গুঢ়স্থল থেকে ভক্তির আতিশয্যে গানের উৎসমুখ যখন উন্মুক্ত হয়ে যেতো, তখন পাছে গানটি ভুলে যান, তাই হিসাবের খাতায় নিজের অজ্ঞাতসারে সেই গানগুলি সমস্ত লিখে রাখতেন। এইভাবে কিছুকাল

DO NOT COPY

গত হল। একদিন তাঁর এক ঊর্ধতন কর্মচারী খাতাগুলি পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখলেন যে খাতায় হিসাবের বদলে আষ্টে পৃষ্ঠে দুর্গানাম কালীনাম আর খালি জগন্মাতার নামগান। তিনি দুর্গাচরণ বাবুকে খাতাগুলি সব দেখালেন। তিনি খাতা দেখে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হলেন। মিত্র মহাশয় সাধারণ ভোগী জমিদার ছিলেন না - তিনি ছিলেন বদান্য, ভগবদ্ভক্ত, পণ্ডিত ও ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তি। তিনি খাতার প্রথম গানটি পড়লেন, একবার নয়, দুবার নয় - বার বার। 'আমি বিনা মাহিনার চাকর তোমার চরণধুলার অধিকারী' এই ছত্রটি পড়বার সময় ভাবে ও ভক্তিতে তাঁর চোখ সজল হয়ে গেল, তিনি মুগ্ধ হয়ে পড়লেন। তিনি বুঝলেন যে, এ ব্যক্তি সাধারণ লোক নন। তিনি রামপ্রসাদকে ডেকে বললেন, "তোমাকে আর সংসার চিন্তা করতে হবে না - সংসারের এ সব তুচ্ছ কাজ করার জন্য তুমি জন্মগ্রহণ কর নি। তুমি মায়ের নাম গুণগানের যে মহত্তর ব্রত গ্রহণ করেছ - তাই তুমি করো, তুমি ঘরে যাও, আমি তোমাকে আজীবন ৩০টাকা করে বৃত্তি দেবো।"

রামপ্রসাদের প্রভু দুর্গাচরণ বাবু হিসাবের খাতায় অসংখ্য গানের মধ্যে যে গানটি খাতা পরীক্ষার সময় প্রথম দেখেছিলেন, সেই গানের কথাগুলি হচ্ছে,

আমায় দেও মা তবিলদারী।
আমি নিমক্‌হারাম নই শঙ্করী।।
পদ-রত্ন-ভাণ্ডার সবাই লুটে, ইহা আমি সইতে নারি।।
ভাঁড়ার জিম্মা যার কাছে মা, সে যে ভোলা ত্রিপুরারি।
শিব আশুতোষ স্বভাবদাতা, তবু জিম্মা রাখ তাঁরি।।
অর্দ্ধ অঙ্গ জায়গির, মাগো, তবু শিবের মাইনে ভারি।
আমি বিনা মাইনের চাকর, কেবল চরণ ধূলার অধিকারী।।
যদি তোমার বাপের ধারা ধর, তবে বটে আমি হারি।
যদি আমার বাপের ধারা ধর, তবে তো মা পেতে পারি।।
প্রসাদ বলে অমন পদের বালাই লয়ে আমি মরি।
ও পদের মস্ত পদ পাই তো, সে পদ লয়ে বিপদ সারি।।

DO NOT COPY

রামপ্রসাদ কৃতজ্ঞচিত্তে দুর্গাচরণ বাবুকে ধন্যবাদ পাঠালেন এবং এই ঘটনার পর থেকে তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের পথ পরিষ্কৃত হল। তিনি কুমারহট্টে চলে গেলেন। মায়ের কৃপায় দুর্গচরণ বাবুর অসীম অনুগ্রহে আর্থিক চিন্তা ও পরাধীনতা থেকে তিনি মুক্ত হলেন, তাঁর সংসার বন্ধন ঘুচলো - তাঁর মন সম্পূর্ণ স্বাধীন হল। তিনি পরম সন্তুষ্ট চিত্তে কুমারহট্টে সাধনপীঠ স্থাপন করে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে মায়ের চরণে সমর্পন করে গাইলেন, "ডুব দে মন কালী বলে - হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে।"

(দুই)

বেশী দিনের কথা নয়, মাত্র পঞ্চাশ বছর আগেও আমাদের দেশের লোকের জীবনযাত্রার মধ্যে অর্দ্ধেক লৌকিক আর অর্দ্ধেক অলৌকিক জিনিষ দেখা যেত। তখন অলৌকিক ঘটনার উপর লোকের বিশ্বাস ছিল, তাই গুরুতর কোন অসুখ বিসুখ হলে মা কালীর কাছে লোকে মানত করতো - বাবা তারকনাথের কাছে 'হত্যা' দিত। ফল তাঁরা নিশ্চয়ই পেতেন কারণ "বিশ্বাসে মিলায় বস্তু-তর্কে বহুদূর।" রামপ্রসাদের জীবনে অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল, এমন কি শোনা যায় যে, জগৎজননী মা এসে তাঁর বাড়ির বেড়া পর্যন্ত বেঁধে দিয়েছিলেন। সে পরিচিত কাহিনী আপনারা জানেন।

আজও প্রাক্তন জন্মের সংস্কারে অনেক অলৌকিক ঘটনা আমাদের জীবনে ঘটে যাচ্ছে দেখতে পাই। কিন্তু এখন সে সব দৈব ঘটনা আমরা স্বীকার করিনা। আমরা বলি যে, আমাদের পুরুষাকারের দ্বারা আমরা নিজেই সব করছি। সেকালে লোকের মনে অহংভাব ছিল না, তাই সংসারে শুভ কিছু হলে, তা ভগবানের কৃপায় হয়েছে, এই কথা সকলে বলতো। এমনকি ঠাকুরের নাম সব সময় করা যাবে বলে, বাড়ির ছেলে মেয়েদের নাম পর্যন্ত তখন দেবদেবীর নামানুসারে রাখা হতো। এখন আমাদের প্রবল অহংবুদ্ধির জন্যে অলৌকিক কথাটা বলতে মন চায় না। কারণ অলৌকিক বললে ভগবানের কৃতিত্ব এসে পড়ে, নিজের পৌরুষ তখন খর্ব হয়। সেই জন্য আধুনিক নরনারী বর্তমান শিক্ষার গুণে অলৌকিক কথাটা বরদাস্ত

DO NOT COPY

করেন না। তবে ভগবান আছেন, তাঁর কৃপাতেই সব কিছু হচ্ছে এ বিশ্বাস এখনও অনেকের আছে। তাই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মায়ের কাছে কেঁদে বলেছিলেন যে, "তুই রামপ্রসাদকে দেখা দিয়েছিলি, আমায় কেন দেখা দিবি না বল?"

হালিশহর কুমারহট্ট প্রধানতঃ শাক্ত প্রধান স্থান বলে বিখ্যাত। কিন্তু এখানে বৈষ্ণবদেরও যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। বিশেষ করে মহাপ্রভুর গুরু শ্রীমৎ ঈশ্বরপুরী কুমারহট্টের রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শ্যামসুন্দর আচার্য। ঈশ্বরপুরীর বাস্তুভিটা এখন 'চৈতন্যডোবা' নামে পরিচিত সে কথা আগে বলেছি। এ ছাড়া শ্রীবাস পন্ডিত, মুরারী গুপ্ত, পদাবলী রচয়িতা বাসুদেব ঘোষ, কীর্তনীয়া মাধবানন্দ ও গোবিন্দানন্দ, রাজা নবকৃষ্ণের নবরত্ন সভার অন্যতম সভ্য দিগ্বিজয়ী পন্ডিত কামদেব বিদ্যাবাচস্পতি শিবানন্দ সেন প্রভৃতি এই গ্রামে ও পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহে বাস করতেন।

রামপ্রসাদের জীবনের সঙ্গে কুমারহট্টের আর একজন সাধকের নাম ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে আছে, তার নাম আজু গোঁসাই। পুরো নাম অযোধ্যারাম গোস্বামী। কেউ কেউ আবার তাঁর নাম অচ্যুত গোঁসাইও বলেন। তিনি ছিলেন পরম বৈষ্ণব একজন গ্রাম্য কবি। ছড়া ও গান রচনায় তাঁর অদ্ভুত শক্তি ছিল। পরিহাস ও রঙ্গরসিকতা করে ছড়া গাঁথা ছিল তাঁর বিশেষত্ব। রামপ্রসাদের গানের খ্যাতি যখন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল তখন আজু গোঁসাই তাঁর গানের বিকৃত অর্থ করে গান ও ছড়া রচনার দ্বারা রামপ্রসাদের গানের প্রত্যুত্তর দিতেন। তাঁর বহু গান ছিল, কিন্তু বিদ্রুপাত্মক গান বলে, কেউ তা মনে করে রাখেনি, তাই তাঁর সব গান আজ লুপ্ত হয়ে গেছে। একবার রামপ্রসাদ আজু গোঁসাইকে লক্ষ্য করে বলেন "কর্মের ঘটে, তৈলের কাঠ আর পাগলের ছাঁট - মলেও যায় না।" পাগলের ছাঁট আজু গোঁসাইকে বলা হয়েছিল। কারণ তাকে লোকে পাগল বলতো। তিনি প্রত্যুত্তরে বলেন কর্মের জের, স্বভাব চোর, মদের ঘোর মলেও ঘুচে না।" মদের ঘোর, রামপ্রসাদ মদ খেতেন বলে, তাঁকে বিদ্রুপ করে বলা হয়েছিল। রামপ্রসাদ পণ্ডিত ছিলেন, আর আজু গোঁসাই ছিলেন আধপাগল। তাঁদের সঙ্গীত যুদ্ধ ও দুই সাধকের গান ও রহস্য কবিতা বঙ্গ

সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। আমি এখানে রামপ্রসাদের গানের পরে আজু গোঁসাইয়ের একটি বিদ্রুপাত্মক গান আপনাদের অবগতির জন্য উদ্ধার করছিঃ

রামপ্রসাদের গান

ডুব দেরে মন কালী বলে।
হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে।।
রত্নাকর নয় শূন্য কখন - দুচার ডুবে ধন না মেলে।।
তুমি দম সামর্থে এক ডুবে যাও, কুলকুণ্ডলিনীর কূলে।।
জ্ঞান সমুদ্রের মাঝে রে মন, শক্তিরূপা মুক্তা ফলে।
তুমি ভক্তি কর কুড়ায়ে পাবে, শিবযুক্তি মতন নিলে।।
কামাদি ছয় কুম্ভীর আছে, আহার লোভে সদাই চলে।
তুমি বিবেক হলদি গায়ে মেখে যাও, ছোঁবে না তার গন্ধ পেলে।।
রতন মানিক্য কত, পড়ে আছে সেই জলে।
রামপ্রসাদ বলে ঝাঁপ দিলে মন, মিলবে রতন ফলে ফলে।।"

আজু গোঁসাইয়ের প্রত্যুত্তর

ডুবিস নে মন ঘড়ি ঘড়ি
দম আটকে যাবে তাড়াতাড়ি।।
একে তোমার কফেনাড়ী, ডুব দিও না, বাড়াবাড়ি।
তোমার হলে পরে জ্বরজারি, মন! যেতে হবে যমের বাড়ী।।
অতিলোভে তাঁতী নষ্ট মিছে কষ্ট কেন করি
ও তুই ডুবিস্‌নে মন ধরগে ভেসে শ্যাম কি শ্যামার চরণ তরী।"

হালিশহর কুমারহট্ট সেই সময় নবদ্বিপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের জমিদারীভুক্ত ছিল। গঙ্গাতীরে মহারাজের একটি সুরম্য প্রাসাদ তখন বায়ুসেবনের জন্য তৈরি ছিল এবং বিশ্রাম লাভের জন্য তিনি প্রায়ই এখানে আসতেন। তাঁর মতন গুণগ্রাহী ও বিদ্যোৎসাহী জমিদার তখন বাংলাদেশে খুব অল্পই ছিল। মহারাজা

বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার মত মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রও সাধকচূড়ামণি আগমবাগীশ, কবি ভারতচন্দ্র, গোপাল ভাঁড়, ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, গুপ্তিপাড়ার বানেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, নবদ্বীপের কৃষ্ণানন্দ বাচস্পতি, শান্তিপুরের রামমোহন গোস্বামী, মধুসূদন ন্যায়ালঙ্কার প্রভৃতি গুণী ব্যক্তিদের তাঁর সভার রত্ন হিসাবে রেখেছিলেন। এক কথায় তৎকালীন প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ সকলেই তাঁর বৃত্তিভোগী সভাসদ ছিলেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নিজে যেমন বিদ্বান ছিলেন, সেইরকম নানা শাস্ত্রে তাঁর জ্ঞান ও পারদর্শিতা ছিল। তাঁর রাজত্বকালে বাংলাদেশে সাহিত্য-শিল্প-সঙ্গীত ও বহুবিধ সামাজিক সংস্কার সাধিত হয়। সাহিত্যের প্রতি অনুরাগের জন্য কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক ও পণ্ডিতদের তিনি বহু অর্থ ও ভূমি দান করে যশস্বী হন। এ ছাড়া মাসিক বৃত্তি দেওয়া ছিল তাঁর নিয়মিত ব্যবস্থা।

একদিন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সন্ধ্যার সময় গঙ্গার ধারে যখন ভ্রমণ করছিলেন তখন অদূরে কোথা থেকে এক সুমধুর সঙ্গীত ধ্বনি তাঁর কানে এলো। যে গানটি তিনি শুনেছিলেন তার একটি কলি হচ্ছে "এখন সন্ধ্যা বেলায় কোলের ছেলে ঘরে নিয়ে চল।" এই ভক্তিমাখা গান শুনে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের হৃদয়ে এক অপূর্ব ভাবের উদয় হলো। তাঁর হৃদয়ের নিভৃত চিত্ততলের করুণ পর্দায় সেই মধুস্রাবী সঙ্গীতের লহরী এমন নাড়া দিল যে, তিনি তখন সেখানে আর থাকতে পারলেন না। ধীরে ধীরে তিনি রামপ্রসাদের গৃহে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

সেখানে গিয়ে কৃষ্ণচন্দ্র দেখলেন পঞ্চমুণ্ডী আসনের উপর বসে সাধক রামপ্রসাদ অর্দ্ধবাহ্যদশায় নীল আকাশের দিকে চেয়ে তাঁর আরাধ্যা দেবী জগন্মাতাকে উদ্দেশ্য করে মধুর কণ্ঠে গান গাইছেন-

মন কেন মায়ের চরণ ছাড়া।
ও মন ভবে শক্তি, পাবে মুক্তি, বাঁধ দিয়া ভক্তি দড়া।

DO NOT COPY

পার্থসারথির ২৪শে জুলাই সংখ্যায় 'সেলা ছুঁয়ে তাওয়াং' লেখার শেষে বুঝিয়েছিলাম অরুণাচলের গল্প কিন্তু শেষ হয়ে যায়নি। আসলে ভালুকপং থেকে শুরু ব্যতিক্রম অবশ্যই সেলাপাস। পশ্চিম অরুণাচলের প্রধান আকর্ষণই এই প্যারাডাইস লেক। দুধ সাদা বরফ প্রকৃতির মাঝখানে নীলজলের খেলা দেখলে মনে হয় স্বর্গ যেন নেমে এসেছে পাহাড় আর লেকের রূপ ধরে। এক কথায় বলা যায় ভালুকপং যদি অরুণাচলের প্রবেশদ্বার হয় তবে সেলা পাশ এক সব পেয়েছির দেশ। তারপর তাওয়াং হয়ে চীনের সীমান্ত বুমলা পর্যন্ত পথের স্বাদ খানিকটা আলাদা বলে সে গল্পটা পরে শোনাবার কথা বলেছিলাম। বলতে পারেন এবারের গল্পটা সেই প্রতিশ্রুতি পালনের গল্প।

তাওয়াং শহরে কমপক্ষে তিনরাত্রি না কাটালে ভালোভাবে সব কিছু দেখে ওঠা মুশকিল। বমডিলা তো বটেই এমনকি চল্লিশ কিলোমিটার এগিয়ে দিরাং থেকে রওনা হলেও সেলা টপকে তাওয়াং পৌঁছাতে দিন গড়িয়ে যাবেই কারণ পথে জং গ্রামের 'নুরনাং' ছাড়াও আরো দু'একটা ফলসের দাবি যে আপনাকে মানতেই হবে। দ্বিতীয় দিনটা কেটে যায় তাওয়াং মনাষ্ট্রি, বিশালবুদ্ধ আর ওয়ার মেমোরিয়াল দেখতে গিয়ে। আজ শোনাব তাওয়াং এর তৃতীয় দিনের গল্প - যেদিন সাত সকালে বেরিয়েছিলাম ভারত চীন সীমান্তের দুর্গম পথ ধরে। কি দেখেছি সেখানে? এক কথায় বোঝানো অসম্ভব। যা দেখেছি তাকে তো হাজার ফটোতেও পাঠকের সামনে তুলে ধরতে পারব না। চোখে দেখেছি ৩৬০ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে, সেখানে স্টিল ক্যামেরায় আর কতটা আসে? টুকরো টুকরো ছবিতে হয়তো আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু সামগ্রিকভাবে একে উপলব্ধি করতে হলে এখানে একবার আসতেই হবে। একটা কথা প্রথমেই বলে নিই যে ইচ্ছে হলো আর বুমলা চলো - ব্যাপারটা কিন্তু অত সহজ নয়। হাজার হোক, ভারত-চীন সীমান্ত, তাই পারমিটের ব্যাপার একটা থাকছেই। চলার পথে এন্ট্রি পয়েন্টে ১০০ টাকা দর্শনীও দিতে হয়। তবে কোন ঝক্কিই যাত্রীদের পোহাতে হয় না এই যা রক্ষে। সব সামলে দেয় লোকাল

ড্রাইভারেরা, যারা এই অঞ্চলকে চেনে হাতের তালুর মত। বুমলায় যেতে চাইলে অন্তত একদিন আগে হোটেল ম্যানেজারকে জানিয়ে দিলেই আপনি নিশ্চিন্ত। তিনিই যোগাযোগ করে নেন লোকাল ট্যাক্সি ইউনিয়নের সাথে। প্রসঙ্গত বলে রাখি লোকাল গাড়ি ছাড়া বুমলার পথের পারমিট কিন্তু জুটবে না। কি ধরণের আর কোন সময়ে যেতে চান জানিয়ে দিলে পরদিন গাড়ি দেখবেন হোটেলের দোরগোড়ায়। জাইলো, বোলেরো, সুমো-যে গাড়িই নেওয়া হোক না কেন ভাড়া ঐ একই - ৫৫০০ টাকা। বোলেরো অথবা সুমোতে লোক নেয় সাধারণত ছ'জন। বোল্ডারময় ভাঙ্গা পথে তার চেয়ে বেশি লোক নিতে ড্রাইভার রাজি হবে না। আমাদের ২৮ জনের ২৪ জন চারটে সুমো ভাড়া করলেও ইন্দ্র-মিমিরা চাইছিল জাইলো। আমার সহধর্মিনীরও বোধহয় ইচ্ছে ছিল তাই। তাসে তাসে মিলে যেতেই 'মন প্যারাডাইসের' মালকিনকে সেটা জানাতে আর দেরি করিনি। তারপর আর কিছু ভাবতে হয় নি। আক্ষরিক অর্থেই পরদিন সাতসকালে ড্রাইভার বাইচুং তার জাইলো নিয়ে হাজির। ড্রাইভিং ছাড়াও ওর প্লাস পয়েন্ট শুধু ফটো সেন্স নয় ফটো তোলার আগ্রহ। এই ছবি তোলার উৎসাহে ও এমন অনেক লেকের সামনে গাড়ি থামিয়েছে, সাধারণভাবে যাদের আমাদের দেখার কথা ছিল না। তাওয়াং থেকে বুমলা কম বেশি ৩৮ কিলোমিটার হবে। ২৮ কিলোমিটার পার হলে ওয়াই (Y) জং এর কাছে পথ হয়েছে দ্বিধান্বিত। বাঁয়ের পথটা গেছে 'সঙ্গতসার' বা 'মাধুরীলেকের' দিকে আর ডানদিকে দশ কিলোমিটার দূরে বুমলা। ১৫২০০ ফুট উচ্চতার এই ইন্দো-চায়না বর্ডারে পৌঁছানো যত না কঠিন, কঠিনতর করে তুলেছে স্থানীয়দের ভয় দেখানো গল্প। "বুড্ঢা, বিমার আউর কমজোর আদমী কো উধার জানা নেহি" – এ কথা প্রায় সকলেই বলবে। অক্সিজেনের স্বল্পতা আর উচ্চতাজনিত কারণে লোকে নাকি প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়ে। সবটাই যে গল্প নয় সেটা আমরাও দেখেছি, তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সমস্যার কারণ প্রয়োজনীয় বিধিনিষেধগুলো না মানা। উচ্চতার কারণে যেখানে বাতাস পাতলা হয়ে আসে সেখানে দৌড়াদৌড়ি তো দূরের কথা, বেশি জোরে কথা বললেও অসুবিধা হতে পারে। এর আগে ১৭৪০০ ফুটের গুরুদোংমার সমেত অনেক হাই অল্টিট্যুডেই

DO NOT COPY

দেখেছি চুপচাপ ধীর পায়ে চললে সমস্যা তেমন একটা হয় না। প্রয়োজনে কোকা-৩০ বা ঐ জাতীয় কোন ওষুধ ব্যবহারে ফল হয়। এমনকি কর্পূরের ঘ্রাণ নিয়েও অনেককে উচ্চতাজনিত সমস্যায় আরাম পেতে দেখেছি। সে যাই হোক, বুমলা পাস আমাদের শুধু আকর্ষণই করেছে - প্যানিক সৃষ্টি করতে পারেনি। তাছাড়া পর্যটকেরা অসুস্থ হয়ে পড়লে সেনাবাহিনী যেভাবে তাদের পাশে দাঁড়ায় তা শুধু ভরসাই যোগায় না, মন ও ছুঁয়ে যায়। ব্র্যান্ডি মেশানো গরম জল দিয়ে, দরকারে অক্সিজেন দিয়ে অসুস্থকে সুস্থ করে তুলতে তো আমরাই দেখেছি। শুনেছি শীতের দিনে বরফে গাড়ি আটকালেও সেনাবাহিনী পরিত্রাতার ভূমিকা নেয়। অক্টোবরের শেষে পায়ের তলায় বরফ না পেলেও তাদের দেখা পেয়েছি কাছে দূরে পাহাড়ের মাথায়। ডিসেম্বর থেকে মার্চে সেনাবাহিনীর বিশেষ ধরণের চাকাওয়ালা গাড়ি ছাড়া এ পথে চলা অসম্ভব হলেও এপ্রিলে এখানে এলে বরফ পাবেন গাড়ির চাকার তলাতেই। শুনেছি চাকায় বিশেষ ধরণের চেন না লাগিয়ে তখন এ পথে গাড়ি চলে না। তারপরেও ফেঁসে গেলে সেনাবাহিনীই একমাত্র ভরসা। সে অভিজ্ঞতার স্বাদ আমরা পাইনি বলাই বাহুল্য, তবু বাইচুং এর কাছে শোনা কথাগুলো পাঠকদের না জানিয়ে পারলাম না।

চলার পথে দূর পাহাড়ের বরফ শিখর যেমন মন ভোলায়, পথের ধারের লেকগুলোও তেমন চলার গতি কমিয়ে দেয় তাদের রূপের পসরা সাজিয়ে। তাওয়াং জেলায় শুনেছি ১১০টি ছোট বড় লেক রয়েছে বিভিন্ন আকার আয়তন আর রঙের বৈচিত্র নিয়ে। এদের মধ্যে 'পি.টি.সো' আর 'মাধুরীলেকের' কথা বেশি আলোচিত হলেও বাকিরা কিছু ফেলনা নয়। তাই পথের পাশে যখনই বাইচুং গাড়ি থামিয়েছে, একটু সময় না দিয়ে সেখান থেকে চলে যাব এমনটা ভাবতেই পারিনি। বুমলায় পৌঁছাবার পর ছোট্ট একটা টেন্টে 'মেজর সাব' এর কাছে নাম লিখিয়ে নতুন করে পারমিট নেওয়ার পালা। অন্যদিকে গরমাগরম কফি নিয়ে আর্মির আপ্যায়ন। সীমান্তে চলতে হয় ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে একেকজন জওয়ানের নেতৃত্বে। সেই জওয়ানই শুনিয়ে দেন এখানকার ভূগোল, ইতিহাস আর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা। চলার পথে সামনের দিক অর্থাৎ চীনা ভূখণ্ডের যথেচ্ছ ছবি নেওয়া গেলেও ভারতীয় দিকের

ফটো তোলার কিন্তু অনুমতি নেই। ব্যাপারটা নিতান্তই হাস্যকর মনে হয়েছে। স্যাটেলাইটের যুগে যেখানে ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে গুগলের ম্যাপ সেখানে আমরা ফটো না তুলতে পারলেও যাদের জন্য এই লুকোচুরি তারা তা দিব্য দেখছে।

ভারতের শেষ সীমান্ত। তেরঙ্গা জাতীয় পতাকার নীচে দাঁড়ালে আবেগে মন ভাসবেই। দূরে চীনা সেনা চৌকিগুলো খালি চোখে পরিস্কার দেখা না গেলেও তার আভাস পাওয়া যায়। লাদাখের শেষ গ্রাম তুরতুক ব্লকের থাং-এ যেমন টেলিস্কোপ রয়েছে পাক সেনাদের নড়া চড়া দেখাতে, এখানে তেমনটা নেই। শুনলাম সারাদিনে অন্তত একবার টহল দিতে চীনা সৈন্যরা আসবেই, তবে সাধারণত সেটা পর্যটকেরা যে সময় বুমলায় থাকে (০৯.০০-১৪.০০), সে সময়টায় নয়। অতএব বুমলা পর্ব শেষ করে আধখানা আবেগ মাখানো মনকে সেখানেই রেখে ফিরে চলি ওয়াই জং-এর দিকে। আগেই বলেছি ওয়াই জং থেকে দ্বিধাবিভক্ত দুটি পথের একটি ধরে আমরা বুমলায় এসেছিলাম। অন্য পথটা এই জং থেকে প্রায় ১৮ কিলোমিটার দূরে 'সঙ্গতসর' লেকের দিকে চলে গেছে। স্থানীয়দের কাছে এই লেক 'সঙ্গতসর' হলেও পর্যটকদের কাছে এর খ্যাতি 'মাধুরীলেক' বলে। কারণ আর কিছুই নয়, 'কোয়েলা' সিনেমায় অভিনেত্রী মাধুরী দীক্ষিতের একটা নাচের দৃশ্য এখানে তোলা হয়েছিল, তাই। নাম যাই হোক না কেন, দুই পাহাড়ের মাঝখানে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে রাতারাতি সৃষ্ট হওয়া এই লেকের সৌন্দর্য কিন্তু দেখবার মত। লেকের জলে অসংখ্য কাঠের খুঁটিই বলে দিচ্ছে ভূমিকম্পে লেক তৈরী হওয়ার আগে এখানে ছিল ঘন জঙ্গলের শোভা। লেক, পাহাড় আর ভারতীয় পতাকায় শোভিত 'সঙ্গতসর' যে আকর্ষণীয়া তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু সে তার প্রাকৃত রূপ হারিয়েছে পার্ক, ক্যান্টিন, হোটেলের সমাহারে এবং অবশ্যই ট্যুরিস্ট স্পটের তালিকায় স্থান পেয়ে। অবশ্য এটাও ঠিক তেমনটা না হলে কি আর এই লেক দেখতে আসতাম? এই অঞ্চলে তো শতাধিক এমনই সুন্দর নানান বর্ণ, নানান আয়তনের লেক ছড়িয়ে আছে - তাদের নাম বা কে জানে আর ক'জন পর্যটকই বা তা দেখতে যায়?

DO NOT COPY

মাধুরী লেক থেকে তাওয়াং ফেরার পথে একটা লেখা বরাবরই চোখে পড়েছে, 'আপনারা এখন শত্রুর নজরাধীন'! কে সেই শত্রু? জঙ্গলের কোন জানোয়ার নয় -পড়শি দেশের মানুষ! যারা হতে পারতো আমার আপনার সব চেয়ে আপন, তারাই খানিকটা জমির অধিকারকে কেন্দ্র করে আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু! ১৯৬২'র আগের সেই 'হিন্দী চিনি ভাই ভাই' স্লোগান আজ বিস্মৃতির অতলে। অরুণাচল ভ্রমণের শেষে এটাই আমার ট্র্যাজিক উপলব্ধি।

বুমলার পথে

পি টি সো লেক

বুমলা পাসের কাছে

মাধুরী লেকের কাছে

Do not copy

মাধুরী লেক

চীন সীমান্তে শেষ সীমান্ত চৌকি

DO NOT COPY

ঘুমোও মেয়ে

শ্রী সুবীর ঘটক

রাত্রি গভীর শরীরে ক্লান্তি,
একটু জিরিয়ে নেওয়া।
সারাদিন শেষে ঘুমের আবেশে,
সুযোগ কুড়িয়ে পাওয়া।
টানা তিনদিন কাজের পাহাড়,
ফুরসৎ মেলা ভার।
কাল সকালেই ফের রুগী দেখা,
একই রুটিন আবার।
মুহূর্তে নামে ঘুম পরীরা,
চোখ বোজে অনায়াসে।
শিয়রে কার হাতের পরশ,
মা বসে এসে পাশে॥
স্বপ্নের ঘোরে পরিচিত ছোঁয়া,
"কেমন আছিস ওরে?"
"ভালো আছি মা ঘুমোই এবার,
আবার উঠবো ভোরে"।
রাত্রি নিঝুম নেই কেউ কোথা,
ঘুমোয় ক্লান্ত মেয়ে।
রাতের তারারা মিটিমিটি জ্বলে
শুধু তার দিকে চেয়ে।
নানা রঙ দিয়ে স্বপ্ন সাজিয়ে,
চাঁদ নামে জানালায়।
জোছনা আঙ্গুল রাখে চাঁদমুখে,
ম্লান মুখ ভরে যায়।

DO NOT COPY

হঠাৎ প্রলয় - হাত পা কাঁপে,
দুরু দুরু কাঁপে বুক।
দুঃস্বপ্নের ক্ষণ নেমে আসে,
ভাঙ্গে স্বপ্নের সুখ।
আঘাতে আঘাত, ধর্ষকামী
দস্যুরা হানা দেয়।
শত চেষ্টায় পারে না তো মেয়ে,
লাগে ভারী অসহায়।
অসম লড়াই একাই করে সে,
পায় না বাড়ানো হাত।
কেমন ভাবে কাটবে এ ঘোর
দুঃস্বপ্নের রাত!
কিছুটা লড়াই, তারপর স্থির,
জীবন যে ছুটি চায়,
না ফেরার দেশে, চলে যায় শেষে,
মৃত্যু হাত বাড়ায়।

চোখে ছিল যত স্বপ্ন, আর
বুকে ছিল আশ্বাস।
শান্ত হয়েছে ক্লান্ত শরীর,
পড়ছে না নিঃশ্বাস।
শব্দগুলো ক্লান্ত হয়েছে,
শুধু দুটো হাত চেয়ে,
দেহটা নিথর - নিস্পন্দ,
ঘুমোও এবার মেয়ে।

DO NOT COPY

বিচার

সুনন্দন ঘোষ

এতো রক্ত ছিল ঐ ছোট্ট শরীরটায়?
ভেসে যাচ্ছে আমার মাতৃভূমি,
ভিজে যাচ্ছে রাজ্ঞীর নীল সাদা শাড়ী।

এতো মায়া ছিল ওই ছোট্ট শরীরে?
কোটি কোটি কোটি কোটি হাত দেশের সীমানা ছাড়িয়ে
মুষ্টিবদ্ধ হচ্ছে --- "বিচার চাই!"

হাজার বছর ধরে শাসকের বাঘনখে রক্তের ধারা -
গুরু অর্জন থেকে গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং।
রক্ত শুকোয় না একুশ শতকেও।

ধর্ম আর রাজনীতির আফিঙে বুঁদ নায়কেরা
শিরদাঁড়া খুলে রেখেছে অর্দ্ধেক শতক।
বানতলা, কামদুনি, হাঁসখালি ভাঙাতে পারেনি বেহুলার ঘুম!

হঠাৎ কোথা থেকে এলো আর জি করের ছোট্ট একটা মেয়ে?
নতুন করে লিখলো ইতিহাস!
দানবের থাবায় শরীরটাকে আহুতি দিয়ে
আলো জ্বেলে দিলো পথভোলা জাতির অস্মিতায় !

বিচার তো হবেই,
এই আদালতে না হোক, সময়ের আদালতে,
খুব দ্রুত।

DO NOT COPY